নজরুলের আত্মদর্শন
ইসলামি মূল্যবোধ ও সৃষ্টি রহস্য

নজরুলের আত্মদর্শন–২ নজরুলের আত্মদর্শন–৩

নজরুলের আত্মদর্শন–৪ নজরুলের আত্মদর্শন–৫

নজরুলের আত্মদর্শন–৬ নজরুলের আত্মদর্শন–৭

নজরুলের আত্মদর্শন–৮ নজরুলের আত্মদর্শন–৯

নজরুলের আত্মদর্শন–১০ নজরুলের আত্মদর্শন–১১

নজরুলের আত্মদর্শন–১২ নজরুলের আত্মদর্শন–১৩

নজরুলের আত্মদর্শন–১৪ নজরুলের আত্মদর্শন–১৫

নজরুলের আত্মদর্শন–১৬ নজরুলের আত্মদর্শন–১৭

নজরুলের আত্মদর্শন–১৮ নজরুলের আত্মদর্শন–১৯

নজরুলের আত্মদর্শন–২০ নজরুলের আত্মদর্শন–২১

নজরুলের আত্মদর্শন–২২ নজরুলের আত্মদর্শন–২৩

নজরুলের আত্মদর্শন–২৪ নজরুলের আত্মদর্শন–২৫

নজরুলের আত্মদর্শন–২৬ নজরুলের আত্মদর্শন–২৭

নজরুলের আত্মদর্শন–২৮ নজরুলের আত্মদর্শন–২৯

নজরুলের আত্মদর্শন
ইসলামি মূল্যবোধ ও সৃষ্টি রহস্য

মোস্তাক আহ্‌মাদ

নজরুলের আত্মদর্শন
ইসলামি মূল্যবোধ ও সৃষ্টি রহস্য
মোস্তাক আহ্‌মাদ

স্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০২৪

রোদেলা ৬৮৮

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
রুমি মার্কেট (২য় তলা) ৬৮-৬৯, প্যারিদাস রোড
(বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০
সেল : ০১৭১১-৭৮৯১২৫,০১৯৭১-৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
অরূপ মান্দী

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনলাইনে পরিবেশক
www.rokmari.com

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৪৮/৩ জাস্টিস লাল মোহন দাস লেন,
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৬৫০.০০ টাকা মাত্র

Nazruler Attmodorshon [Islami Mullobod O Sristi Rohossho] by Mostaque Ahmad
First Published *Ekushe Book Fair 2024*
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
68-69, Paridas Road (Banglabazar), Dhaka-1100.
E-mail : rodela.prokashani@gmail.com
Web. www.rodelaprokashani.com

Price : Tk.650.00 only US $ 10.00
ISBN : 978-984-97380-9-1 Code : 688

উ ৎ স র্গ

আমার প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ, যিনি খেলাফত দ্বারা আমাকে নতুন জীবন দান করেছেন, বাংলায় সুফিবাদ প্রচারের নির্ভীক কলম সৈনিক, সুফিবাদ সার্বজনীন আদর্শের সংস্কারসাধনকারী মহান সুফি সাধক ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা ঈমান আল-সুরেশ্বরীর আওলাদ– খেলাফতধন্য গদ্দিনসীন সাহেবজাদা, পরম শ্রদ্ধেয় ভাইজান বেদম ওয়ার্সী আল-জাহাঙ্গীর-কে, জীবদ্দশায় বাবা জাহাঙ্গীর যাঁকে মজ্জুবপ্রেমিক বা সুফিপ্রেমের দিওয়ানা বলে সম্বোধন করেছেন। বেদম ওয়ার্সী আল জাহাঙ্গীর একজন নজরুল প্রেমিক ও সুফিবাদ সার্বজনীন তত্ত্বের মহা প্রচারক।

ভূমিকা

নজরুলের ইসলামি কবিতা, প্রবন্ধ, সংগীত এক মহান আত্মদর্শনে সমৃদ্ধ। তাঁর ভাবনা ও চেতনার গভীরে যেমন সর্বমানুষের মুক্তির কথা ধ্বনিত হয়েছে, তেমনি স্রষ্টা ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও রহস্য সম্বন্ধেও নজরুল কথা বলেছেন। এ গ্রন্থে আমরা বাস্তব দৃষ্টান্তের দ্বারা তা উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছি।

ইসলামি দর্শনের দৃষ্টিতে মানব জাতি এক আদমের সন্তান এবং সেজন্য এক পরিবারসদৃশ। মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্বের আসন ধূলিসাৎ করে এক স্রষ্টার প্রভুত্বের আওতায় বিশ্বমানবের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভের মধ্য দিয়ে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, সম্প্রীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নজরুল নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁর মতে ইসলামি সমাজ-ব্যবস্থার লক্ষ্যও তাই। সেই আদর্শের বাণী যে কবি পেশ করেছেন, তিনি সেই সার্বজনীন মানবধর্মের বাণী প্রচারক সর্বমানুষের কবি নজরুল। তাই নজরুল লিখেছেন—

‘কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনি ক ইসলাম
সত্য যে চায় আল্লাহ মানে মুসলিম তারি নাম।’

এ বাণী সর্বকালীন সত্য। সুতরাং সেই বক্তব্য-সম্পৃক্ত বাণী যে সকল মানুষের জন্য, তা জিজ্ঞাসার ঊর্ধ্বে। নজরুল মনের চিন্তা-চেতনা ধ্যান-ধারণা ও আত্মিক প্রেরণার ভেতর লুকিয়ে আছে এক মহান প্রেমিক সত্তা। যে সত্তা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অধীন। ইন্দ্রিয় জ্ঞান দ্বারা নজরুলকে নানা প্রতিভায় ভূষিত করা যায় ঠিকই কিন্তু সাধক ও প্রেমিক নজরুলকে উপলব্ধি করা যায় না। আমরা নজরুলকে এতদিন যেভাবে চিনে এসেছি তা নজরুলের স্বভাবজাত প্রকাশ ও প্রচলিত ধারণার ভিত্তিতে। কিন্তু সার্বজনীন সাম্যবাদের বাণী প্রচারক, সর্বমানুষের কবি ও সুফিতাত্ত্বিক প্রেমিক সত্তায় নজরুলকে নতুনভাবে জানার ও চেনার বসন্ত সময় উপস্থিত হয়েছে। নজরুল সর্বযুগের সর্বকালের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর সাম্যবাদী চেতনা ও সুফিরহস্যের স্বরূপ ও প্রকৃতিকে জানতে পারলে আমরা একথার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হব।

নজরুল বহুমুখি প্রতিভার অধিকারী। তাঁকে নির্দিষ্ট বলয়ে মূল্যায়ন করার দুঃসাহস আমার নেই। আমি যেহেতু দুটি বিশেষ দিকের স্বরূপ ও প্রকৃতি অনুসন্ধানের দ্বারা তাঁর প্রেমিক সত্তা ও সার্বজনীন মানবধর্মের বাণীর মর্মার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করেছি তাই এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

নজরুল সাহিত্যের একটি বিরাট অংশজুড়ে ইসলামি দর্শন ও নবির আদর্শের অনুসরণীয় শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। বলা বাহুল্য, সার্বজনীন মানবিক মূল্যবোধের যে আদর্শ ও বাস্তব দৃষ্টান্ত ইসলাম বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছে, সে দর্শন কোন বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠীর আদর্শ শুধু নয়, তা বিশ্বমানবের।

এ মহান কবি, প্রেমিক, সুফিতাত্ত্বিক ও নবির আদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী নিজেকে ইসলামের একজন খাদেমরূপে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেছেন। ইসলামের বিশ্বপ্রেমিক মানবতাবাদী চিন্তাধারাকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁর সৃষ্টির এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে ইসলামভিত্তিক লেখা ও নবির আদর্শ শিক্ষার তাগিদ। নবি ও আহলে বাইতের প্রেম, সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষণীয় আদর্শ, ইসলামের মহানুভবতা ও কুরআনের শাশ্বত বাণীর মর্মার্থ উপলব্ধি।

“নজরুলের আত্মদর্শন ইসলামি মূল্যবোধ ও সৃষ্টি রহস্য” অনুসন্ধানী গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই পাঠকদের জন্য এই গ্রন্থের অবতারণা।

নজরুলের দান সকল মানুষের জন্য। এটা আমাদের গর্ব যে, তিনি বাঙালি, বাংলা মায়ের সন্তান। সব মহৎ শিল্পী-সাহিত্যিকের মতোই তিনি স্ব-জাতি মুসলমান কিন্তু ভেবেছেন বিশ্বমানবের কথা। এমন মহৎপ্রাণ কবি বিশ্বে বিরল। শুধু তাই নয়, তিনি স্ব-জাতির কথাও ভেবেছেন সার্বজনীনভাবে। প্রিয় নবিজীর আদর্শ ও কুরআনের মর্মবাণীর সার্বজনীন চেতনাকে বাঙালি জাতি ও মুসলিম সমাজ বিনির্মাণের জন্য দিক-নির্দেশনামূলক তথ্য ও তত্ত্ব প্রদান করেছেন। বিশেষ করে বাঙালি মুসলিম সমাজের জন্য তাঁর অনুভূতি অপরিমেয়।

একথা সত্য যে, নজরুল সাহিত্য জগতের বহু দিক এখনো অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। তাঁর সৃষ্টি সম্ভার সংগ্রহের সার্বিক ব্যবস্থাপনা আজো বাস্তবায়িত হয়ে ওঠেনি। সে সম্ভাবনা এখনো বাস্তবায়ন সাপেক্ষ! তবে আশার কথা এই যে, বর্তমান সময়ে অনেক লেখক ও গবেষক নজরুলকে নিয়ে ভাবছেন এবং তাঁর বিশাল সাহিত্য জগতের নানা দিক সম্পর্কে গবেষণা করে চলেছেন। তাঁদের সবাইকে সম্মান ও সাধুবাদ জানাই।

কাজী নজরুল ইসলাম এমন একজন কবি ও শিল্পী যাঁর নিখাদ ভালোবাসা ও সর্বমানুষের প্রতি দায়িত্ব ও মানবতাবোধ বিশ্বের আর কোনো কবি মাঝে দেখা যায়নি। একজন মানুষের ভাবনার জগৎ তথা চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্র ফুল-ফসলে এত সমৃদ্ধ ও শোভিত করার ইতিহাস বিশ্বে বিরল।

নজরুলের সময়ে দেশ ছিল পরাধীন। তাই জাতি সর্বক্ষেত্রেই বঞ্চিত ও গঞ্জনার শিকার হয়েছিলেন। মানুষের অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য তিনি ‘আমি সৈনিক’ প্রবন্ধে দেশ ও জাতির মহাদুর্যোগময় মুহূর্তে এক মহাসৈনিকের আগমন কামনা করেছেন, যিনি দেশকে মহাবিপদের হাত থেকে রক্ষা করবেন।

নজরুল ছিলেন আজন্ম বিপ্লবী। তাঁর প্রতিটি রক্তবিন্দুতে শাণিত তরবারির ক্ষুরধারা প্রবাহিত ছিল। অন্যায় অবিচার জুলুম নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সদা সোচ্চার। নজরুল মনে করেন, আমাদের দেশে দু'ধরনের পুরুষ আছে; এক ধরনের পুরুষের ভালোবাসায় আছে নারীর মতো করুণার প্রাধান্য, আর এক ধরনের পুরুষের প্রেমে আছে, আঘাত, বিদ্রোহ। বর্তমান সময়ে দেশ সেই পুরুষ চায়, যার ভালোবাসায় আঘাত আছে, বিপ্লব আছে। সে দেশকে ভালোবাসে শুধু চোখের জলই ফেলে না, দরকার হলে আঘাত করে এবং প্রতিঘাত বুক পেতে নিতে পারে। নজরুলের ধারণা, দেশ ঘুমিয়ে পড়েছে, দেশকে আঘাত দিয়ে, দেশের অগ্নিসিন্ধুতে ফুঁ দিয়ে আবার জাগাতে হবে। এর জন্য তিনি কল্পনা করেছেন এক মহা সেনাপতির, এক মহা শক্তির যাঁর ইঙ্গিতে লক্ষ কোটি দেশ প্রেমিক সৈনিক তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হবে। তিনি কল্পিত মহা বিদ্রোহীকে অনুরোধ জানান, যেদিন তুমি আসবে সেদিন যেন তোমারই পতাকা তলে তোমার দেয়া তরবারি করে, রক্তসৈনিক বেশে দাঁড়াতে পারি, সেদিন হৃদয়ের শোণিত মাখা তরবারি তোমার পদতলে অর্ঘ দিয়ে যেন তোমার রক্ত আঁখির প্রসাদ দিতে বঞ্চিত না হই।[১]

বীর সেনাপতির অধীনে যুদ্ধ করতে করতে যেদিন শত্রুর বর্শাতে নজরুলের বুক বিদ্ধ হবে, রক্তহীন দেহ ধূলায় লুটিয়ে পড়বে সেদিন হবে তাঁর জন্য সবেচেয় সুখের দিন। মহাসৈনিকের কাছে নজরুলের অনুরোধ, 'সেদিন তুমি বলো প্রভু', বৎস। তুমি আমার কর্তব্য করেছ।[২]

নজরুল এক মহান প্রেমিক সত্তা। স্রষ্টার প্রতি তাঁর প্রেম যেমন অকৃত্রিম তেমনি সৃষ্টির প্রতি প্রেম অপরিসীম। সে কারণে নজরুল মনেপ্রাণে মরমি তথা সুফিধারার সমর্থক। নজরুল রচনায় লালন ভাবাদর্শের যে ঘনিষ্ঠতা ও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। নজরুল স্রষ্টাপ্রেমিক হিসেবে সুফিদের মতোই পরম সত্যের অন্বেষণী।

প্রাচীন কাল থেকে দেহের মধ্যে গভীর সত্য উপলব্ধি করা হচ্ছে দেহাত্মবাদে বিশ্বাসীদের সাধনা, মরমি, বাউল, ফকিরদেরও একমাত্র সাধনা দেহকে কেন্দ্র করে। বাংলার মরমি কবি লালন ছিলেন এই ধারার একজন সাধক পুরুষ। তাঁর মতে দেহের মধ্যে পরম সত্যকে না জেনে বা তার সন্ধান না করে শুধু ধর্মের বাহ্যিক অনুশাসনে তীর্থ কর্ম অর্থহীন। তাই গানে তিনি বলেছেন—

আছে আদি মক্কা এই মানব দেহে
দেখ না রে মন ভেয়ে
দেশ-দেশান্তরে দৌড়ে এবার
মরছো কেন হাঁফিয়ে।

প্রায় একই ভাবময়তা নজরুলের গানেও সুস্পষ্ট—

১. কোথা তুই তীর্থ যাবি মন
এই তোর মক্কা মদিনা
জগন্নাথ-ক্ষেত্র এই হৃদয়।

লালনের একটি গানে আছে :

২. কেন খুঁজিস মনের মানুষ বনে সদায়।

আর নজরুলের রচনায় :

৩. খুঁজিস যারে পাহাড়-জঙ্গলময়
সে যে রে তোরি মাঝে রয়।

তাই বলা যায় নজরুলের আধ্যাত্মিক কবিতা ও গানে মরমি-বাউল-ও লালন ভাবনা স্পষ্ট। নজরুল প্রতিভা এইজন্য পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছিল। ধূমকেতুর মতো এসে সময়কে তিনি মাতিয়ে রেখেছিলেন দ্রোহে, তাঁর হাতেই আবার বাঁশের বাঁশরী। ফলে 'কোথা তুই তীর্থ যাবি মন' এই ভাব-চেতনাও তাঁকেই মানায় এবং তাঁকে আরো ঋদ্ধ করে, আরো ব্যাপ্তি দেয়। অনেকের ধারণা বাউল ও লালন চেতনা রবীন্দ্র মনে যেভাবে পড়েছিল নজরুলের রচনায় সে অর্থে তেমন পড়েনি। কিন্তু ভালোভাবে খেয়াল করলে দেখা যাবে নজরুল মানসে মরমি-বাউল ও লালন ভাবনার উপস্থিতি সুস্পষ্ট। লালনগীতি ও বাউল গানের সঙ্গে নজরুলের শুধু পরিচয়ই ছিল না, তাঁর বেশ কয়েকটি গানে বাউল এবং লালনগীতির প্রভাব রয়েছে সরাসরি। এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য লালন ফকিরের (১৭৭৪—১৮৯০) গানের সঙ্গে নজরুলের জীবন ও তাঁর শিল্প আলোচনা অত্যন্ত জরুরি। নজরুলের স্নেহধন্য লালনগীতির শিল্পী ও বিশিষ্ট বাউল কবি মহিন শাহের (১৯০৩—১৯৯৬) একটি সাক্ষাৎকার, নজরুলের বন্ধু কথাসাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯০৪—৭৬) একটি বিবরণ এবং কতিপয় নজরুল রচনার আলোকে নজরুল মনন-চেতনায় লালন প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। নজরুল ছিলেন লালনগীতির একজন সমঝদার, ভক্ত ও অনুরাগী শ্রোতা। মহিন শাহ জানান, (ম. মনিরুজ্জামান সাক্ষাৎকার নেন) কবি জসিম উদ্দীন এক সময় ফরিদপুরে তাঁর এলাকায় মুর্শিদা গানের দল গঠন করে ছিলেন। এই দলে মহিন শাহ ছাড়া এদোন ফকির, ফাগো ফকির, আমির ফকির, হেরোন ফকির প্রমুখ মরমি গানের কণ্ঠশিল্পী ছিলেন। নজরুল বেশ কয়েক বার ফরিদপুরে গিয়েছিলেন। একবার নজরুলের আগমন উপলক্ষে কবি

জসিম উদ্দীনের বাড়িতে মুর্শিদা গানের আসর বসেছিল। সেই আসরে দুটি স্বরচিত গান পরিবেশন করেছিলেন নজরুল। অতঃপর শুরু হয়েছিল মুর্শিদা গানের পালা। গান শেষে জসিম উদ্দীনকে নজরুল জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমাদের দলে কেউ লালন ফকিরের গান জানে?' জসিম উদ্দীন মহিন শাহকে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'এই ছেলেটি জানে'। সেদিন মহিন শাহ নজরুলকে দুটি লালনগীতি গেয়ে শুনিয়েছিলেন। ঘটনার যথাযথ সন-তারিখ মহিন শাহ স্মরণ করতে না পারলেও নিজের বিবাহের এক কি দুই বছর পর এই ঘটনা ঘটেছিল বলে উল্লেখ করেন। সে হিসেবে সময়কাল ১৯৩০ সাল কিম্বা ১৯৩১ সাল ছিল। সেই দিন নজরুলকে মহিন শাহ 'প্রথমে রসুল রসুল বলে ডাকি' লালনের এই গানটি শুনিয়েছিলেন। নজরুল মহিন শাহকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, লালনের কোনো উচ্চমার্গের গান তার জানা আছে কি-না, তখন মহিন শাহ লালনের এই গানটি গেয়েছিলেন—

আকার কি নিরাকার সাঁই রাব্বানা,
আহাদ আর আহমদের বিচার হলে যায় জানা ॥
আহামদ নামে দেখি
মিম হরফে লেখে নবি
মিম গেলে আহাদ বাকি
আহামদ নাম থাকে না ॥

মহিন শাহ জানান গানটি শুনে খুবই খুশি হয়েছিলেন নজরুল। সে সময় নজরুলের সফরসঙ্গী হয়ে মহিন শাহ কলকাতায় যান। সেখানে একটি চায়ের দোকানে চাক্‌রি নিয়ে কিছুকাল নজরুলের কাছাকাছি ছিলেন। এর ফলে সমকালীন নজরুল পরিবেষ্টিত কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য ঘটেছিল তার। মহিন শাহ সেদিন নজরুলকে লালনের 'আকার কি নিরাকার সাঁই রাব্বানা' গানটি শুনিয়েছিলেন। নজরুলের লেখা দুই-একটি গানের সঙ্গে লালনের এই গানটির সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। প্রসঙ্গত সমসময়ে নজরুলের প্রকাশিত জুলফিকার (আশ্বিন ১৩৩৯/১৯৩২) গ্রন্থের একটি গানের প্রথম অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

আহমদে ওই মিমের পর্দা
উঠিয়ে দেখ মন
আহাদ সেথায় বিরাজ করেন
হেরে গুণীজন।

মহিন শাহের মতো আরো কিছু লালনগীতির ভাবশিল্পীদের কাছে লালনের গান শুনেছিলেন নজরুল। মহিন শাহের বিবৃত ঘটনার চার-পাঁচ বছর পূর্বে নজরুলের একজন কাছের মানুষ প্রখ্যাত লোকসঙ্গীত সংগ্রাহক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের 'শাহ লালন ফকিরের গান' নামক প্রবন্ধ কলকাতার মাসিক 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল ১৩৩৩ (১৯২৬) সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। এই প্রবন্ধে সংগৃহীত তিনটি লালনগীতির সঙ্গে 'আকার কি নিরাকার সাঁই রাব্বানা' গানটিও ছিল। তাছাড়া মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের বিখ্যাত 'হারামণি' গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৯০ (বৈশাখ ১৩৩৭) সালে। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সংবলিত 'হারামণি'তে লালনের অন্যান্য গানের সঙ্গে আলোচ্য গানটিও মুদ্রিত হয়েছিল। মনসুর উদ্দীনের 'হারামণি' প্রথম খণ্ড নজরুলের এত বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে যে, এ সম্পর্কে তিনি কবি আবদুল কাদিরের 'জয়তী পত্রের' ১৩৩৭ (১৯৩০) সালের শ্রাবণ সংখ্যায় স্বতঃস্ফূত আবেগে লিখেছিলেন, 'ভৈরব নদীর তীরে ঝাউ-তলায় নিরালায় বসে 'হারামণি' দেখছিলাম। এ গানে বাঙলার স্নেহ-সিঞ্চিত ভেজা মাটির গন্ধ, বাঙলার নিরক্ষর পল্লী-কবির অনাড়ম্বর প্রকাশ স্বচ্ছতা, নিরিবিলি প্রাণ, নিস্তরঙ্গ, স্তব্ধতা, এত কোলাহলমুখর জলসার জন্য নয়। কাকাতুয়ার স্বর শুনে যারা অভ্যস্ত, 'এক তারা'র এই ভ্রমর গুঞ্জন তারা হয়তো শুনতেই পাবে না'। প্রকৃত পক্ষে মহিন শাহের কণ্ঠে শোনার পরে কিংবা মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের মাধ্যমেই হোক লালনের 'আকার কি নিরাকার সাঁই রাব্বানা' গানটির ভাব ও ভাষায় নজরুল দারুণ ভাবে আকর্ষিত হন।[৩]

নজরুল ইসলামের আধ্যাত্মিক দর্শনে ফকির লালন শাহ্ এর প্রভাব থাকলেও বলা যায়, তিনি মারেফতের গুপ্তজ্ঞান পবিত্র কুরআন শরীফ থেকে অর্জন করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহামাদুর রাসুলুল্লাহ'-এই কালেমাই সৃষ্টির অনাদি মন্ত্র। এই মন্ত্রের দ্বারাই আসমান ও জমিনের যা কিছু আছে তা সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামি চিন্তাবিদগণ মনে করেন, অনাদি কালে স্রষ্টার মনে প্রেমের সঞ্চার হয়েছিল। এই তাড়নায় তিনি সৃষ্টির কাজে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। প্রেম ছাড়া কিছুই হয় না; প্রেমের দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সংঘঠিত হয়। যেখানে প্রেম নেই সেখানে বিশৃঙ্খলা অনিবার্য। স্রষ্টার প্রেম সৃষ্টির মাধ্যমে বিকশিত হচ্ছে অনন্তকাল ধরে। এই প্রকাশের মন্ত্র হচ্ছে কালেমা তাইয়্যেবা বা আদিমা। মানব-মানবির প্রেম বিভিন্ন রিপুর আশ্রয়ে বিকশিত হয়। সাধারণ ভাবে চিন্তা করলে মনে হবে রিপু আমাদের চরম শত্রু। কারণ রিপুর তাড়নায় আমাদের আদি পিতাকে বেহেশত হতে বের হতে হয়েছে। ষড় রিপুর কারণে মানুষকে দোজখের কঠিন আজাব ভোগ করতে

হবে। ফেরেশতাদের মধ্যে রিপু নেই তাই তাদের মধ্যে কোনো পাপবোধ নেই। কিন্তু রিপুকে শত্রু না ভেবে তার যথাযথ ব্যবহার করলে মানুষের পক্ষে পরম সত্তার গুণাবলি অর্জন করা সম্ভব।

ইসলাম মানব জীবনের শুধু বাহ্যিক সুবিধাসমূহকেই ব্যবহার করে না, বরং মানব জাতির কীর্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। এই মনোভাব ইসলামে ধর্মতাত্ত্বিক ধারণাবলির বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়। ইসলাম যখন দিকে দিকে বিস্তার লাভ করে, তখন তা বিভিন্ন সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও প্রথার অধিকারী বহু জাতির সংস্পর্শে আসে। এভাবে ইসলামিচিন্তা নতুন পরিবেশের আলোকে মুসলমানদের আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তন সাধন করে।

কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী জগৎ অনাদি ও অনন্ত। অনন্ত কাল ধরে জগৎ নির্যাস (essence) হিসেবে অপূর্ণ অবস্থায় ছিল। তবে পরবর্তীকালে যখন তাতে গতি সঞ্চার হয় তখন সেখানে দেহ ও প্রাণের উদ্ভব ঘটে। কুরআনে যখন সৃষ্টির কথা বলা হয়, তখন সেই অনাদি স্থবির নির্যাসে গতি সঞ্চালনের কথাই বলা হয়। বিষয়টি একটু সহজ করে বলা যায়, কুরআনের তথ্য অনুযায়ী আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস দ্বারা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে, মানুষও সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ নিজরূহ থেকে আদমের দেহে রূহ সঞ্চার করেন। ফলে আদম জীবন্ত হয়। অনুরূপ ভাবে নিজের অস্তিত্ব দ্বারা আল্লাহ মহাবিশ্বকে জীবন্ত করেছেন।

তওহীদ এর অর্থ আল্লাহর একত্ববাদ। অর্থাৎ আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা। আল্লাহ আসমান-জমিনে যা কিছু আছে তা সৃষ্টি করেছেন। কোনো কিছুই চালক ছাড়া চলতে পারে না। আল্লাহ সারা জাহানের চালক। কাজে, গুণে, মর্যদায়, ক্ষমতায়, মহিমায় ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অদ্বিতীয়। সমগ্র মখলূক তাঁর দয়ার মুখাপেক্ষী। তিনি মাখলূকের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। তাঁর বন্দিগী করার জন্যই তিনি বিশ্বজগৎকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের যাবতীয় প্রশংসা এবং ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত একমাত্র তিনিই। এতে কোনো অংশী বা দায় নেই। তাঁর জ্ঞান অসীম; তিনি চিরস্থায়ী, অনন্তকাল পর্যন্ত তাঁর অস্তিত্ব বিরাজ থাকবে। সমস্ত মাখলূক একদিন নিশ্চিহ্ন হলেও তিনি ধ্বংস হবেন না। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। আল্লাহকে সব বিষয়ে একক ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করার নামই তওহীদ। আমরা কালেমা তাইয়্যেবা উচ্চারণ করে আল্লাহর এই একত্ববাদের কথা স্বীকার করে থাকি। এই স্বীকৃতি হলো ঈমানের প্রথম ধাপ। সুরা তা-লাক্ব আয়াত ১২-এ আল্লাহ বলেন :

'আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্তস্তর আকাশ এবং অনুরূপ সংখ্যায় জমীন; এদের পরে অবতীর্ণ হয় তার নির্দেশ যেন তারা জ্ঞাত হইতে পারে। আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান-আর সবকিছুই আল্লাহ বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন।'

সারা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ, তাঁর প্রতি এই ঈমানই সব ধর্মের মূল ভিত্তি। আল্লাহ আসমান ও জমীনের নূর। এই নূরতত্ত্বই তওহীদ বা একাত্ববাদের আদি মন্ত্র। এই মন্ত্রের উপর বিশ্বাস করে যে জীবন পরিচালিত করবে সেই চরম সফলতা লাভ করবে। আল্লাহ সুরা ইব্রাহীমে বলেছেন : 'দেখনা, কীভাবে আল্লাহ দৃষ্টান্তদেন-কালেমা তাইয়্যেবার দৃষ্টান্ত। এক পবিত্র বৃক্ষ, যার মূল সুদৃঢ় আর তার শাখা আকাশপানে বিস্তৃত। প্রত্যেক মৌসুমেই সে তার রবের অনুমতিতে ফল দিয়া থাকে; আর আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন, যেন তারা গ্রহণ করে উপদেশ। কালেমা খাবীছার দৃষ্টান্তঃ এক খবীছ অসার বৃক্ষ, যার মূল ভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন-নাই তার কোনো স্থিতি। যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী আল্লাহ তাদিগে ইহ ও পরকালে রাখিবেন সুপ্রতিষ্ঠিত। এবং বিভ্রান্তিতে রাখিবেন আল্লাহ জালেমদিগে-যা ইচ্ছা আল্লাহ তাই করেন।'

সুরা ইব্রাহীম, আয়াত : ২৪-২৮

এই আয়াত হতে স্পষ্ট বুঝা যায় কালেমা তাইয়্যেবাই সমস্ত জিকিরের মূল শক্তি। আল্লাহ যেমন সমগ্র দুনিয়ার স্রষ্টা, প্রতিপালক, তেমনি তাঁর রাসুলও সমগ্র সৃষ্টির রাসুল, 'সমগ্র বিশ্বের জন্য করুণা স্বরূপ'। পবিত্র কুরআনে তিনি উল্লেখ করেছেন 'উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন খোদা তিনি, যিনি তাঁর বান্দাদের ওপর ফয়সালাকারী কিতাব নাযিল করেছেন, যেন তা সমগ্র বিশ্ববাসীকে সতর্ক করতে পারে। পৃথিবী ও আকাশের সমগ্র কর্তৃত্ব সেই খোদারই। তাই রাসুল (সা.) হলেন : 'রাহামাতুল্লিল আল আমিন' বা সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত। আল্লাহ এবং মুহাম্মদ (সা.) এর সম্পর্ক হচ্ছে সূর্য এবং তার আলোর মতো। আল্লাহ সৃষ্টি প্রক্রিয়ার শুরুতে নূরে মুহাম্মদ (সা.) নামে একটি নূর সৃষ্টি করেছেন। পরে সেই নূর থেকে সমগ্র বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তাই আল্লাহ পবিত্র কুরআনে রাসুল (সা.) কে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, মুহাম্মদ (সা.) কে সৃষ্টি না করলে তিনি বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করতেন না। তাই সুরা আহজাবের ৫৬ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন : তিনি রাসুলের প্রতি সম্মান জানিয়ে দরুদ পাঠ করছেন, সমগ্র সৃষ্টিকেও তা আদবের সাথে পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয় তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতিও করুণাময়। সুরা আহজাবের আয়াত ৪১-৪৩-এ আরো বলেছেন : 'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর। তিনি ও তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী তোমাদের প্রতি দরুদ প্রেরণ করেন, তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোতে লইয়া যাইবার জন্য; তিনি মোমেনদের জন্য করুণাময়।'

আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সুরা ইমরানের ১৯১-১৯৫ আয়াতে দাঁড়ায়ে, বসিয়ে, শুইয়ে সর্বাবস্থায় জিকির করতে বলেছেন। তারপরও তিনি সুরা তূর আয়াত ৪৮-এ বলেছেন : 'তুমি ধৈর্যসহ স্বীয় রবের নির্দেশের প্রতীক্ষ কর; আছ তুমি আমার দৃষ্টির সামনে, যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর, তখন রবের সপ্রশংসা তাসবীহ পড়।'

আল্লাহ সুরা আনকাবূতের ৪৫ আয়াতে জিকিরকে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত বলে ঘোষণা করেছেন। শুধু তাই নয়, জিকিরকারিদের উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। সুরা কাহাফের আয়াত নম্বর ২৮-এ তিনি রাসুল (সা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন : 'আপনি ঐ সমস্ত লোকের সহিত বসিতে অভ্যস্ত হউন যাহারা সকাল-বিকাল আল্লাহর জিকির করিতে থাকে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই তাহাদের একমাত্র ফিকির।' এছাড়া সুরা ফাতাহ্' আয়াত : ৯-তে আবার বলেছেন : 'যাতে তোমরা আল্লাহ তাঁর রাসুলের ওপর বিশ্বাস রাখ এবং সাহায্য ও সম্মান কর; আর পড় সকাল-বিকাল আল্লাহর তাসবীহ।

সুরা জুমায় আয়াত : ১০-এ আল্লাহ সুফল প্রাপ্তির পথ হিসেবে জিকিরের কথাই উল্লেখ করেছেন : 'আল্লাহকে অধিকতর স্মরণ কর যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও।'

পবিত্র কুরআনের এইসব নির্দেশ নজরুল ভালোভাবে পালন করতেন। তিনি খুব গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন আল্লাহর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা না থাকলে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। নজরুল ইসলাম আত্মার রোগ বলতে বুঝতেন সর্বদা পাপে লিপ্ত থাকা, পূর্ণ কার্য হ'তে আত্মাকে বঞ্চিত রাখা। তিনি বিশ্বাস করতেন, অসুস্থ আত্মার সুস্থতার জন্য হিংসা, লোভ, মোহ-মাৎসর্য্য, অহংকার, শেরেকি কার্য থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। মিথ্যা প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা, ধর্মীয় হানা-হানির দ্বারা আত্মার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য নষ্ট হয়; ঐশী প্রেমের অনুভূতিশক্তি সর্বতোভাবে বিলুপ্ত হয়। অপরদিকে অশেষ পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে অন্তর দর্পণ পরিস্কার হয়। এছাড়া মানবতার সাধনার দ্বারা স্রষ্টার নৈকট্য লাভ অত্যন্ত সহজ হয়। সত্য ও ন্যায়ের শিক্ষার মাধ্যমে মানব জাতির প্রকৃত উপকার সম্ভব।

রাসুল (সা.) হচ্ছেন সমগ্র মানব জাতির একমাত্র হেদায়েতকারী ও পথ প্রদর্শক। তাঁর প্রতি আনুগত্য ও অনুসৃতি আমাদের আত্মিক ব্যাধি ও নৈতিক দুর্বলতার প্রতিষেধক। নবি-রাসুলদের পরবর্তীতে অলি-আল্লাহ, পীর-মুর্শিদকে আল্লাহর যোগ্য উত্তরসূরী রূপে নির্বাচন করেছেন। এই পবিত্র দলটি পৃথিবীর সমস্ত ধর্মভীরু মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে যুগে-যুগে তাঁদের শিক্ষা ও হেদায়াতের প্রদীপ উজ্জ্বল করে তুলে ধরছেন। আজ মানুষের জীবনে কল্যাণ,

সৌভাগ্য, নৈতিকতা, সৎ কর্ম অর্থাৎ উন্নত জীবনের সমস্ত গুণাবলির যে প্রভাব রয়েছে তাতে এই মনীষীগণের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তাই নজরুলের আধ্যাত্মিক কবিতা ও গানে আল্লাহ, রাসুল এবং তাঁর পরবর্তীতে এইসব মহৎ ব্যক্তিগণ ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আছেন। কাজী নজরুল ইসলামের আত্মদর্শনের সর্বত্রই এ কথাই ধ্বনিত হয়েছে।

–মোস্তাক আহমাদ

নজরুলের অজানা কাহিনি ও বিরল প্রতিভার পরিচয়

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ মে কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাজী ফকির আহমদ, মাতা জাহেদা খাতুন। চুরুলিয়ার কাজী পরিবারের পূর্বপুরুষ সুফি মুহম্মদ ইসলাম পাটনা থেকে সেখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তিনি চুরুলিয়ার আদালতে কাজী নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং সে থেকেই তাঁর বংশের সঙ্গে কাজী পদবী যুক্ত হয়। কাজীদের বৈষয়িক অবস্থা পূর্বে খুবই ভালো ছিল। অর্থ যশ প্রতিপত্তি সহ পারিবারিক ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ ছিল নজরুল ইসলামের পূর্বপুরুষের জীবনধারা। জনশ্রুতি ও বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, বাংলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের পূর্বে পাটনা অঞ্চলে অর্থ-সম্পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল নজরুলের পূর্বপুরুষ। ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার পলাশীর বিপর্যয়ের পর ইংরেজদের হাতে বাংলার স্বাধীনতা বিপন্ন হলে নজরুলের পূর্বপুরুষ অর্থ বিত্ত ও প্রতিপত্তি হারাতে থাকেন। এমতাবস্থায় তারা বর্ধমান জেলার আসানসোলে চলে আসেন। এখানেও নজরুলের দাদা বেশ জৌলুসের সাথে জীবন যাপন করছিলেন। কিন্তু পুরো বাংলা ইংরেজদের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হওয়াতে আদালতের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও কর্তৃত্ব ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়, তাতে তাঁর দাদার কাজী পদ হারাতে হয়। এভাবে দীর্ঘ সময় ইংরেজ শাসনে সুবিধা বঞ্চিত কাজী নজরুলের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবার বিপর্যয়ের মুখে পড়ে স্বচ্ছলতা হারাতে থাকেন। একসময় তাঁর পিতা কাজী ফকির আহমদের জীবনে দারিদ্রতার কালো ছায়া নেমে আসে। ফকির আহমদের আমলে সচ্ছলতার কনামাত্রও অবশিষ্ট ছিল না। নজরুলের মতো শৈশবে পিতৃহীন হয়ে ফকির আহমদ ঘোরতর দারিদ্র্যে পতিত হয়েছিলেন। তাই দারিদ্র্যই ছিল নজরুলের আজন্ম সঙ্গী। বিদ্যাশিক্ষার জন্য নজরুলকে গ্রামের মক্তবে ভর্তি করা হয়। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। নজরুলের বয়স যখন মাত্র আট তখন ফকির আহমদের মৃত্যু হয়। দরিদ্র সংসার এবার তীব্রতর দারিদ্র্যে নিক্ষিপ্ত হল। ছেলে-মেয়েদের দুটি খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখাই মা জাহেদার সামনে সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। ১৯০৯ সালে মক্তব থেকে নিম্নপ্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন

নজরুল। কিন্তু পড়াশোনা আর এগোলো না। পেটের দায়ে সেই মক্তবেই মাত্র দশ বছর বয়সে ছাত্র পড়ানোর কাজ নিলেন তিনি। সেই সঙ্গে নিলেন হাজী পাহলোয়ানের মাজারে খাদেম ও পীরপুকুর মসজিদে ইমামের কাজ। এক আশ্চর্য জীবন সংগ্রাম শুরু হল কিশোর নজরুলের। এই দুঃখজর্জর কৈশোরই তাঁর মধ্যে কবিত্ব ও সংগীত-প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। বাংলার সঙ্গে আরবি, ফার্সী, উর্দু প্রভৃতি শব্দ মেশানো এক প্রকার মিশ্র ভাষায় তাঁকে ইসলামি ভাবাশ্রিত গান রচনা করতে দেখা যায় প্রথম। চুরুলিয়া মক্তবের শিক্ষক কাজী ফজলে আহমদের কাছে নজরুল আরবি ফার্সী শিখতে শুরু করেছিলেন। সে শিক্ষা আরো কিছুদূর অগ্রসর হয় পিতৃব্য কাজী বজলে করীমের তত্ত্বাবধানে। বজলে করীম বাংলায় গীতরচনা ছাড়াও উর্দুতে গজল রচনা করতেন। সুর রচনায়ও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। তাঁর প্রেরণায়ই নজরুল ইসলামি গান রচনায় মনোনিবেশ করেন। সে সময়কার নজরুল রচনার প্রায় সবই অবলুপ্ত। যে দুয়েকটি গান উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তা তেকে উদ্ধৃতি দেয়া গেল :

১. কর ভাই বন্দেগী
খোয়াইওনা আর অবহেলায় জেন্দেগী
শরমেন্দেগী হবে হাশরের মাঝে।

২. নামাজ পড় মিঞা, ওগো নামাজ পড় মিঞা,
সবার সাথে জামাতেতে মসজিদেতে গিয়া,
তাতে নেকী পাবে বেশি
পর সে হবে খোশী
থাকবে নাকো কীনা প্রেমে পূর্ণ হবে হিয়া।

চুরুলিয়ার দিকে সে সময় লেটো গানের খুব জনপ্রিয়তা। গ্রামে গ্রামে লেটোর দল। যাত্রা ও কবিগানের মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল লেটো। কবিগানের মতো দুই দলে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জয়পরাজয়ের ভিত্তিতে লেটো গান অনুষ্ঠিত হতো। কবিয়ালের মতো লেটো দলেও থাকতেন একজন দলপতি। তিনি নিজ দলের জন্য গান বাঁধা ছাড়াও আসরে দাঁড়িয়ে দল পরিচালনা করতেন। লেটোতে বিষয়ভিত্তিক পালা থাকত। যাত্রার ধরনে অভিনয় ও নাচ ছিল লেটো রূপায়ণের অঙ্গ।

ইতোমধ্যেই নজরুল গান বাঁধতে আর তাতে সুরযোজনা করতে পারছেন। এবার মক্তব আর খাদেমগিরি ছেড়ে এলেন লেটোর দলে যোগ দিতে। অধিকতর অর্থোপার্জনের আশা ও সহজাত সংগীতপ্রিয়তা, এ দুয়ের প্রেরণায়ই নজরুল লেটোর দলে যোগ দিয়ে থাকবেন। এ ব্যাপারেও তাঁর পথ প্রদর্শক